রউফুর-রহীম

নবিজীবনের বিশুদ্ধ ও বিস্তারিত গ্রন্থনা

ড. ‘আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

SEAN
PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

রউফুর-রহীম: নবিজীবনীর বিশুদ্ধ ও বিস্তারিত গ্রন্থনা
ড. 'আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি
গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৯ সিয়ান পাবলিকেশন

প্রথম বাংলা-সংস্করণ
জুমাদা'উল-আখিরা ১৪৪০ হিজরি। মার্চ ২০১৯
ISBN: 978-984-8046-04-3
www.seanpublication.com
+88 01781 183 501

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট-মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি অথবা অন্যকোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন-সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

'Raufur-Rahim: An Authentic and Detailed account on the Life of Prophet ﷺ', the Bengali version of the book 'Seeratun-Nabawiyah' by Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, Translated by Fakhrul Islam, Edited by Abu Tasmiya Ahmed Rafique, published by Sean Publication Limited of Bangladesh.

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
দোকান নং ৩, দ্বিতীয় তলা
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮০ ১৯২১ ৭৬২৮২৫

সূচি

সম্পাদকের কথা ১৩

আভাষ ১৯

৩২ **নবিজির নুবূওয়াত-পূর্ব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা**

কর্তৃত্বশীল সভ্যতা ও তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ৩৩

রোমান সাম্রাজ্য ৩৩

পারস্য সাম্রাজ্য ৩৪

ভারত ৩৫

তৎকালীন ধর্মীয় অবস্থা ৩৭

আরবদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এবং তাদের সভ্যতার ইতিহাস ৪৩

প্রাচীন আরব ৪৩

প্রাচীন আরবের সভ্যতা ৪৬

ইসলাম-পূর্ব আরবের সার্বিক পরিস্থিতি ৪৯

ধর্মীয় অবস্থা ৪৯

রাজনৈতিক অবস্থা ৫২

অর্থনৈতিক অবস্থা ৫৪

সামাজিক অবস্থা ৫৭

চারিত্রিক অবস্থান ও নৈতিকতা ৬৮

জন্মলগ্নে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা ৭৭

যামযাম কূপ খনন ৭৭

হাতিবাহিনীর কাহিনি ৮১

হাতিবাহিনীর ঘটনার শিক্ষা ৮৭

রাসূলুল্লাহর জন্ম থেকে হিলফুল-ফুযূলের ঘটনা পর্যন্ত ৯৩

রাসূলুল্লাহর বংশানুক্রম ৯৩

পিতা ‘আবদুল্লাহর বিয়ে ও মাতা আমিনার স্বপ্ন ৯৫

রাসূলুল্লাহর জন্ম ৯৭

নবিজিকে স্তন্যদান ৯৮

হালীমা আস-সা‘দিয়্যা ৯৯

মায়ের মৃত্যু এবং পর্যায়ক্রমে দাদা ও চাচার দায়িত্বভার গ্রহণ ১০৬

মেষ চরানোর কাজে রাসূল ﷺ ১০৭

মেষ চরানোর মধ্যে নিহিত কল্যাণ ১০৮
সকল পাপাচার থেকে সুরক্ষা ১১১
বুহাইরা পাদরির সাক্ষাৎ ১১৩
ফিজার যুদ্ধ ১১৫
হিলফুল-ফুযূল ১১৭
নুবূওয়াতের পূর্বে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১২১
খাদীজার ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণ এবং তাঁকে বিবাহ ১২১
কা'বা নির্মাণে নবিজির অংশগ্রহণ ১২৫
নবিজির নুবূওয়াতকে স্বাগত জানানোর জন্য লোকদের প্রস্তুতি ১২৯
রাসূলুল্লাহর নুবূওয়াত সম্পর্কে আহলুল-কিতাব মনীষীদের সুসংবাদ ১৩৪
সেসময়কার মানুষদের সাধারণ চিত্র ১৩৬
নবিজির নুবূওয়াতের নিদর্শন ১৩৭

১৪০ **প্রথম ওয়াহি এবং দা'ওয়াতের সূচনা**

প্রথম দিন ওয়াহি অবতীর্ণের ঘটনা ১৪১
নেকস্বপ্ন ১৪৩
নির্জনপ্রিয়তা ও হেরা গুহায় ধ্যানমগ্নতা ১৪৪
ওয়াহির অবতরণ ১৪৫
ওয়াহি অবতীর্ণের বিভিন্ন পদ্ধতি ১৫১
দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে একজন সৎ স্ত্রীর ভূমিকা ১৫৪
খাদীজার প্রতি নবিজির বিশ্বস্ততা ১৫৮
যুগে যুগে নবি-রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ ১৫৯
'এবং ওয়াহির আগমন কিছু সময় বন্ধ রইল' ১৬০
গোপনে দা'ওয়াত ১৬১
আল্লাহর বাণী প্রচারের নির্দেশ ১৬১
গোপনীয়তা রক্ষা করে দা'ওয়াতের সূচনা ১৬৩
অবিরাম দা'ওয়াত ১৭৫
প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের কিছু প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য ১৭৯
নবিজির ব্যক্তিত্বের প্রভাব ১৮১
দারুল-'আরকামের পাঠ্যসূচি ১৮৩
দারুল-'আরকামকে বেছে নেওয়ার কারণ ১৮৪
প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের কিছু বৈশিষ্ট্য ১৮৫

ইসলামের দা'ওয়াতের প্রচার ও এর বিশ্বজনীনতা ১৮৯
মাক্কা যুগে আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন ১৯৩
পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর প্রগাঢ় অনুধাবন ১৯৩
পরিবর্তনের রীতি এবং আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে এর সংশ্লিষ্টতা ১৯৭
সাহাবিদের আকীদার সংশোধন ১৯৮
সাহাবিদের ওপর জান্নাতের বর্ণনার প্রভাব ২০০
সাহাবিদের মনে জাহান্নামের বর্ণনার প্রভাব ২০১
তাকদীরের সঠিক অনুধাবনের প্রভাব ২০২
মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে সাহাবিদের অনুধাবন ২০৩
আদম ﷺ ও শয়তানের গল্প থেকে সাহাবিদের শিক্ষা ২০৩
জগৎ, জীবন ও বিভিন্ন সৃষ্টজীবের প্রতি সাহাবিদের দৃষ্টিভঙ্গি ২০৪
মাক্কী যুগে চারিত্রিক সৌন্দর্য ও 'ইবাদাতের ভিত্তি স্থাপন ২০৭
আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ ২০৭
মানসিক প্রশিক্ষণ ২১০
শারীরিক প্রশিক্ষণ ২১১
উত্তম চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ দান ২১২
কুরআনের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে সাহাবিদেরকে চারিত্রিক প্রশিক্ষণ দান ২১৪

২২২ প্রকাশ্য দা'ওয়াতের সূচনা : মুশরিকদের প্রবল বাধা
প্রকাশ্য দা'ওয়াত ২২৩
দা'ওয়াতের পথে মুশরিকদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ২২৭
কুরআনের ব্যাপারে তাদের অবস্থান ২৩৭
পরীক্ষা নেওয়ার স্বাভাবিক রীতি ২৪১
পরীক্ষা ও কষ্টের পেছনে প্রজ্ঞা এবং উপকারিতা ২৪২
দা'ওয়াতের বিরোধিতায় কাফিরদের কৌশল ২৪৬
কুরাইশ-সভাসদদের বৈঠক ও নবিজিকে আঘাত ২৬৬
রাসূলুল্লাহর সাহাবিদের নির্যাতন ভোগ ২৭০
নিরাপত্তার বিষয়ে উম্মু জামীলের সচেতনতা ২৭৩
রাসূল ﷺ তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন যে যে বিষয়ের ওপর ২৯০
মাক্কায় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ ২৯৮
সাহাবিদের আত্মিক পরিশুদ্ধতায় কুরআনের প্রভাব ৩০৬
আলাপ-আলোচনার পদ্ধতি ৩১৩

যার যার ধর্ম তার তার ৩২০
মাক্কা যুগে ইহুদিদের ভূমিকা এবং মাক্কার মুশরিকদের তাদের সাহায্য গ্রহণ ৩৩৩

৩৪৮ **আবিসিনিয়ায় হিজরাত, মি'রাজ ও তায়িফের ঘটনা**
কার্যকারণ প্রক্রিয়ার নিয়ম মেনে পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহর কাজকর্ম ৩৪৯
আল্লাহর ওপর ভরসা ও কার্যকারণ গ্রহণ ৩৫০
আবিসিনিয়ায় হিজরাত ৩৫৩
আবিসিনিয়ায় হিজরাতের কারণ ৩৫৩
কেন আবিসিনিয়া ৩৫৬
আবিসিনিয়া যাত্রা ৩৫৭
আবিসিনিয়ায় মুসলিমদের দ্বিতীয় হিজরাত ৩৬১
জা'ফার ﵁ ও নাজ্জাশির কথোপকথন ৩৬৪
নাজ্জাশি ও মুহাজিরদের মাঝে বিভেদের আরেকটা অপচেষ্টা ৩৬৬
নাজ্জাশির ইসলাম গ্রহণ ৩৬৭
আল্লাহর রাসূল ﷺ হিজরাত করলেন না কেন ৩৮৪
দুঃখের বছর ও তায়িফের কষ্ট ৩৮৭
চাচা আবু তালিবের মৃত্যু ৩৮৭
খাদীজার মৃত্যু ৩৮৮
তায়িফে দা'ওয়াত ৩৮৮
কেন তায়িফ ৩৯১
মিনতি ও প্রার্থনা ৩৯৫
নুবূওয়াতি মমত্ববোধ ৩৯৬
পরিবর্তনের ধারা ৩৯৮
জিনদের ইসলাম গ্রহণ ৪০৬
ইসরা ও মিরাজের ঘটনা ৪১১
সালাতের গুরুত্ব ও তার মর্যাদা ৪২৫
মিরাজের রাত্রিতে দেখা কিছু সামাজিক ব্যাধি ৪২৫

৪২৮ **সাহাবিদের মাদীনায় হিজরাত এবং তার প্রেক্ষাপট**
বিভিন্ন গোত্রের সাহায্য কামনা ৪২৯

বিভিন্ন গোত্রকে দীনের পথে দা'ওয়াত দেওয়ার সময় আবু
জাহ্লসহ মুশরিকদের চক্রান্ত মোকাবিলায় রাসূলুল্লাহর পদ্ধতি ৪৩০
বানু 'আমিরের সঙ্গে সংলাপ ৪৩২
বানু শাইবান গোত্রের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ৪৩৩
কল্যাণের মিছিল ও আলোর অগ্রণীদল ৪৩৯
হাজ্জ-'উমরার মৌসুমে আনসারদের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ ৪৩৯
আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সূচনা ৪৪১
প্রথম বাই'আতুল-'আকাবা ৪৪২
'আকাবার দ্বিতীয় আনুগত্যের শপথ ৪৫১
প্রান্তটীকা ৪৬৪

সম্পাদকের কথা

আলহামদু লিআহলিহ ওয়াস-সালাতু লিআহলিহা

স্বনামধন্য কুরআন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন'-এর সাথে যুক্ত হয়েছিলাম এই শতাব্দীর শুরুর দিকে। প্রথম দশকের বড় একটা অংশ জুড়ে যুক্ত ছিলাম এই প্রতিষ্ঠানের সাথে। শ্রদ্ধেয় জনাব হাফেজ মুনির উদ্দীন সাহেব অত্যন্ত যত্নের সাথে হাতে ধরে ধরে অনুবাদ ও সম্পাদনার নানারকম কলাকৌশল শিখিয়েছিলেন আমাকে। কতটুকু শিখতে পেরেছি জানি না; তবে আজ অনেক বছর পর যখন ইসলামের ইতিহাস সিরিজের সম্পাদকীয় লিখতে বসেছি, তখন সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে নিজের অজান্তেই চোখের কোণ ভিজে উঠছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনিই তাঁর বান্দাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন।

ড. সাল্লাবির লিখনীর সাথে যখন থেকে আমার পরিচয় তখনও 'সিয়ান'-এর জন্ম হয়নি। সেই ২০০৭/৮ সালের কথা। তন্ময় হয়ে আরব এক শাইখের একটি লেকচার সিরিজ শুনতাম। যতক্ষণ শুনতাম মনে হতো যেন টাইম মেশিন রিওয়াইন্ড করে চৌদ্দশ বছর আগে ফিরে গিয়েছি। যেন হাঁটছি মাদীনার অলিগলিতে। ঘুরে ফিরছি বাদ্‌র আর উহূদের প্রান্তরে।

এই লেকচার সিরিজে প্রায় প্রতিটি ঘটনার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও উপদেশগুলো তুলে ধরার সময় যাদের নাম অবধারিতভাবে এসে যেত, তাদের অন্যতম হলেন ড. সাল্লাবি। যতদূর জানি, সে-সময়ে তার বইগুলো ইংরেজিতে প্রকাশ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। বক্তা আরব হওয়ায় তিনি সাল্লাবির রচনা থেকে সাহায্য নিতে পেরেছেন। লেকচারার ও লেকচার সিরিজের প্রতি ভালোবাসার সাথে সাথে অবচেতন মনে এই লেখকের লেখার প্রতিও তৈরি হয়ে যায় গভীর এক ভালোবাসা।

'সিয়ান' শুরু করার পর যখনই ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কাজ করার প্রসঙ্গ সামনে এসেছে, আমার প্রথম পছন্দ ছিলেন ড. সাল্লাবি। পরামর্শ-সভায় উত্থাপন, আলোচনা এবং নানা দিক খতিয়ে দেখার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আমরা ড. সাল্লাবির ইতিহাস সিরিজ নিয়েই কাজ করব।

যেহেতু নীতিগতভাবে 'সিয়ান' সম্ভাব্য ক্ষেত্রে লেখকের অনুমোদন ছাড়া কারও রচনা কিংবা তার অনুবাদ প্রকাশ করার বঙ্গীয় অনৈতিকতাকে সমর্থন করে না, তাই ড. সাল্লাবি থেকে অনুমোদন গ্রহণের প্রসঙ্গটি সামনে চলে আসে। 'সিয়ান'-এর তৎকালীন অন্যতম দায়িত্বশীল শরিফ আবু হায়াত অপু ভাইয়ের উপর দায়িত্ব পড়ে যোগাযোগ স্থাপনের। তিনি মূল আরবি প্রকাশক লেবাননের দার আল মা'রিফার সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হন এবং প্রকাশক ও লেখক উভয়ের পক্ষ থেকে বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার লিখিত অনুমতিপত্র সংগ্রহ করেন।

এরপর আমরা রাসূলুল্লাহর সীরাত নিয়ে কাজ শুরু করি। একজন পূর্ণকালীন আরবি অনুবাদক নিয়োগ দেওয়া হয়, শুধু সাল্লাবির রচনাগুলো অনুবাদ শুরু করার জন্য। সীরাতুর-রাসূলের প্রায় অর্ধেক অনুবাদ সম্পন্ন হওয়ার পরই 'সিয়ান'-এর উপর প্রথম ঝড়টি আসে। ঠিকমতো কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর আগেই প্রবল এ ঝড়ে অনেক কিছু লন্ডভন্ড হয়ে যায়।

ইতোমধ্যে আমার সৌভাগ্য হয় এর ইংরেজি অনুবাদগুলো চেখে দেখার। জায়ান্ট দুটি প্রকাশনা সংস্থা দারুস-সালাম ও আইআইপিএইচ থেকে এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। দারুস-সালাম থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলো পড়ার পর আমি কিছু জায়গা আরবির সাথে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে বেশ হোঁচট খেলাম, আবার একই সাথে অনুবাদকের প্রশংসা না করেও পারলাম না।

তারা গ্রন্থগুলোকে আক্ষরিক কিংবা ভাবানুবাদ না করে অনেক স্থানে যেন একে ইংরেজি সংস্করণ হিসেবে প্রস্তুত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই ভার্সনে অনারব পাঠকদের অবস্থা বিবেচনায় এনে মাঝেমধ্যে কিছু বিষয়কে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

এরপর আমি আরও কিছু অংশের ক্রস-চেক করে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, ইংরেজি সংস্করণের রচনার যে-স্টাইলটি অনুসরণ করা হয়েছে তা অনারবদের জন্য বিশেষায়িত একটি পদ্ধতি। আর আমরা যেহেতু বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য কাজ করব, তাই আমরা তার কিছু বই আরবি থেকে না করে ইংলিশ থেকে অনুবাদ করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সে-মতে আবু বাক্‌র, 'উমার ও 'উসমানের জীবনী ইংরেজি থেকে অনুবাদ করিয়েছি। তবে 'আলির জীবনী থেকে আমরা আবার মূল আরবিতে ফিরে আসি।

কারণ, সম্পাদনার সময় আরবির সাথে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, কিছু কিছু জায়গাতে উত্তম সংযোজনের পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিত বিয়োজনও করা হয়েছে। কোথাও এমন মনে হয়েছে যে, ইংরেজি অনুবাদক হয়তো ইতিহাসের রূঢ় বাস্তবতাকে হজম করতে পারেননি; একটু কাটছাঁটের কাঁচি চালিয়েছেন। আমরা তার থেকে উত্তম অংশ গ্রহণ করেছি আর অনুত্তমটুকু বর্জন করে মূলানুগতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি।

আল্লাহ চান তো ইসলামের ইতিহাস নিয়ে রচিত ড. সাল্লাবির প্রত্যেকটি বই আমরা ধারাবাহিকভাবে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের উপহার দেব।

রাসূলুল্লাহর পর খুলাফা' রাশিদূন উম্মাহর সেরা প্রজন্ম। তাদের সময়ে ইসলাম যতটা বিশুদ্ধ, যতটা প্রভাবশালী ছিল, অন্য আর কোনো সময়ে ততটা ছিল না। যতটা সম্মান আর আত্মমর্যাদা নিয়ে কালের সে অধ্যায়ে মুসলিমরা জীবনযাপন করেছেন, ইতিহাসে তেমন আর কোনো অধ্যায় আজ অবধি আসেনি।

আফসোসের বিষয়, আমরা বর্তমান প্রজন্মের মুসলিমরা সমাজ ও জীবন-বিধ্বংসী নায়ক-গায়ক, খেলোয়াড়-মডেল কিংবা হালের প্রতাপশালী শাসকদের সম্পর্কে যতটা জানি, খুলাফা' রাশিদূনের মহান ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ততটাই কম জানি।

মুসলিম উম্মাহর সার্বিক অবস্থার সাথে আমাদের এই ঔদাসীন্যের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আমরা যদি পুনরায় আমাদের সেই গৌরবোজ্জ্বল সময়টা ফিরিয়ে আনতে চাই, তাহলে নক্ষত্রসম এই মানুষগুলোর জীবনাচার ও কর্মধারা সম্পর্কে জানা ও তা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কোনো বিকল্প নেই।

দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম উম্মাহর বর্তমান করুণ অবস্থা নিয়ে যখনই কোনো সচেতন ব্যক্তি ভাবতে বসেন, তখন তার মনে অবধারিতভাবে এই ভাবনা উদিত হয় যে, আজকের উম্মাহকে এই দূরাবস্থা থেকে বের করে আনার জন্য একজন 'উমারের বড় প্রয়োজন।

তার অন্তরে যে আল্লাহভীরুতা, বুদ্ধিতে যে প্রখরতা, দৃষ্টিতে যে দূরদর্শিতা, ব্যক্তিত্বে যে মূর্ছনা এবং নেতৃত্বে যে মুনশিয়ানা ছিল—সেসবের কাছে এই উম্মাহ চিরকাল ঋণী।

সত্যিই আবু বাক্‌রের পর 'উমারই ছিলেন উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান। এই উম্মাহ ও ফিতনার মাঝে তিনি ছিলেন এক অভেদ্য দেয়াল, এক বন্ধ দরজা। আততায়ীর হাতে তার নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে যেদিন সেই দরজা ভেঙে গিয়েছে আর তা বন্ধ করা যায়নি—যাবেও না হয়ত আর কোনোদিন।

উম্মাহর কল্যাণ-কামনা ছিল অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত বাসনা; আর সে কল্যাণ সাধন ছিল তার দিবানিশি ধ্যান-জ্ঞান। উম্মাহর অনেক শাসক তার চেয়ে অনেক দীর্ঘকাল শাসন করলেও 'উমারের শাসনামল হলো মানবেতিহাসে, উম্মাহর ইতিহাসে দেদীপ্যমান জ্বলন্ত সূর্যের মতো। গোটা মানবেতিহাসের মধ্যে যেন জ্বলজ্বল করছে।

আমরা আশা করি, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি: এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনীর আলোকচ্ছটা যেন সর্বপ্রথম আমাদের এই জাতিকে উদ্ভাসিত করে। এর হাত ধরে যেন আগামী দিনে 'উমারের মতো যোগ্য নেতৃত্ব বেরিয়ে আসে উম্মাহর কল্যাণ সাধনে।

আমরা 'উমারের শাসনামল নিয়ে রচিত এই গ্রন্থটির প্রচ্ছদে এমন একটি রং ব্যবহার করেছি, যার মাধ্যমে একই সাথে তার শাসনামল যেমন অন্য সকলের শাসনামলের মাঝে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকে, তেমনি তার ব্যক্তিত্বকেও প্রস্ফুটিত করে তোলে।

লাল রং শক্তিমত্তা ও ক্ষমতাকে বোঝায়। তবে এটা নির্মম শক্তি নয়, কটকটে লাল নয়। এ শাসন কল্যাণকামিতার শাসন; আদর-ভালোবাসা ও স্নেহের শাসন।

আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এ বইটি প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল আরও অনেক আগে। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। 'সিয়ান'-এর উপর দিয়ে একের পর এক ঝড় বয়ে যাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। যাক, অবশেষে বইটি আলোর মুখ দেখছে এতেই শান্তি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কাজ করা এক সুবিশাল কর্মযজ্ঞ। "'উমার ইবনুল-খাত্তাব : জীবন ও শাসন" সেই দীর্ঘ অভিযানে আমাদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ। বিশাল এই কাজে রয়েছে অনেকের অবদান। পর্দার পেছনেও জড়িয়ে আছে অনেকের ঘাম। সিয়ানের প্রিন্ট ম্যানেজার আতিকুর রহমান ভাই বইটিকে সুন্দর করতে সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতাকে অভিজ্ঞতা দিয়ে পূরণের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। ফিন্যান্স ম্যানেজার তৌহিদুর রহমান, সেলস ইনচার্জ তোফায়েল মৃধা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সীমাহীন অবদান রেখেছেন। পুরো বইটি পৃষ্ঠাসজ্জা হয়ে আসার পর বইটিকে আরও একবার দেখে দিয়েছেন আমাদের আরবি অনুবাদক মাহমুদুল হাসান এবং হাসান শুয়াইব। বইটির উৎকর্ষ বাড়াতে তাদের অবদানও নেহাত কম নয়। আল্লাহ আমাদের সবার কষ্টটুকু কবুল করে নিন।

মহান আল্লাহর সৃষ্টিই যে একমাত্র নিখুঁত—মানুষের প্রতিটি কাজ তার সাক্ষ্য বহন করে চলে। শতভাগ চেষ্টার পরও মানুষের কোনো কাজই নির্ভুল ও নিখুঁত নয়; ভুল থাকবে, আরও উন্নত করার সুযোগ থাকবে সবসময়ই। আমাদের এ কাজটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে আমরা আমাদের দিক থেকে চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখিনি।

আপনি পাঠক হিসেবে কোনো ভুল বা অসংগতি আপনার দৃষ্টিগোচর হলে ইমেল অথবা ফোনে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি।

গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পথে আমাদের এই পথ চলায় আপনি হোন আমাদের অংশীদার।

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
প্রধান সম্পাদক
সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
অক্টোবর ২২, ২০১৮

আভাষ

সকল গুণগান আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি; প্রার্থনা করছি তাঁর সাহায্য ও ক্ষমার। যার পথকে আল্লাহ দীনের আভায় উদ্ভাসিত করেছেন, তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে এমন কেউ নেই। আর যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া তাকে পথ দেখায় এমন কে আছে? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি এ-ও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সা. তাঁর বান্দা ও রাসূল।

"ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো। মুসলিম না হয়ে (অথবা পুরোপুরি আল্লাহর অনুগত না হয়ে) মৃত্যুবরণ করবে না।"

[সূরা আলু 'ইমরান, ৩:১০২]

"মানুষ! তোমাদের সেই রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজনমাত্র ব্যক্তি (আদম) থেকে। এরপর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনীকে; আর বিস্তার করেছেন ঐ দুজন থেকেই অগুনতি নর-নারী। যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে (যার যার পাওনা) চেয়ে থাকো, সে-ই আল্লাহকে ভয় করো। রক্ত-সম্পর্কের ব্যাপারেও সাবধান থেকো। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। [সূরা আন-নিসা, ৪:১]

"মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। সঠিক কথা বলো। তা হলে তিনি তোমাদের কাজকর্ম সংশোধন করে দেবেন। মোচন করবেন তোমাদের পাপরাশি। আর যেকেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, মহাসফলতা অর্জন সে করবেই।"

[সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৭০-৭১]

প্রভু গো, সব প্রশংসা আপনারই; আপনার মাহাত্ম্য এবং মহান আধিপত্যের কারণে সব গুণগান আপনারই প্রাপ্য। আপনি খুশি হওয়া পর্যন্ত প্রশংসা আপনার, খুশি হলে প্রশংসা আপনার, খুশি হওয়ার পরও প্রশংসা কেবল আপনারই।

রাসূলের সীরাত অধ্যয়ন প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শাস্ত্রটি তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো দিক আমাদের সামনে তুলে ধরে। রাসূলের ব্যক্তিত্ব, তাঁর জীবনাচার, বাণী এবং কোনো বিষয়ে তাঁর সমর্থন সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করা সহজ হয় এই সীরাত পাঠেই। মনের মুকুরে জন্ম হয় তাঁর প্রতি ভালোবাসা। ক্রমাগত পাঠে সে ভালোবাসা খুঁজে পায় গন্তব্যে পৌঁছানোর পথ। নবিজির সঙ্গে থেকে যারা ইসলামের জন্য কষ্ট করেছেন, জিহাদ করেছেন, এমন মহান সাহাবিদের সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যাবে সীরাত অধ্যয়নে। এই অধ্যয়নই সাহাবিদের ভালোবাসতে, তাদের পথ ও মত অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করবে অধ্যয়নকারীকে।

সীরাতগ্রন্থ নবিজির জীবনের ছোটবড় সকল দিক স্পষ্টভাবে তুলে ধরে আমাদের সামনে; জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত—তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন, আল্লাহর পথে মানুষদের আহ্বান, শত বাধা-বিপত্তির মুখে তাঁর পাহাড়সম দৃঢ়তা এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়লাভ, সবকিছুই ঠাঁই পেয়েছে এই শাস্ত্রে। একাধারে তিনি যে একজন স্বামী, বাবা, সেনানায়ক, যোদ্ধা, প্রশাসক, রাজনীতিবিদ, অভিভাবক, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী, কৃচ্ছতা অবলম্বনকারী এবং সর্বোপরি একজন বিচারক—এই দিকগুলোও বাদ যায়নি এখানে।

একজন মুসলিম সীরাত অধ্যয়নে খুঁজে পাবে তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য।[১] দা'ঈ পাবেন তার দা'ওয়াতের কৌশল, বুঝতে পারবেন উত্তরণের বিভিন্ন ধাপগুলো। প্রতিটি পর্যায়ের যথার্থ উপায় সম্পর্কে পাবেন যথোচিত ধারণা। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে, তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে গিয়ে তিনি সেখান থেকে উপকৃত হবেন। পদে পদে অনুধাবন করবেন, আল্লাহর কালিমার পতাকাকে উড্ডীন করতে গিয়ে কী কষ্টটাই না স্বীকার করেছেন রাসূল সা.! কত সুনিপুণভাবে বাধা-বিপত্তি সামলেছেন! তখন তার সামনে একটি প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেবে—তিনি যে সমস্যার সম্মুখীন এক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপটি কী? উত্তর খুঁজতে তিনি তখন দ্বারস্থ হবেন সীরাতের।

নবিজির সীরাত অধ্যয়নে একজন অভিভাবক বা একজন সমাজ সংস্কারক পাবেন প্রতিপালন ও মানুষের ওপর তার ভালো কাজের প্রভাব বিস্তারে নবিজির আদর্শ

[১] দেখুন: আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ: অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ, ড. মুহাম্মাদ ফারিস, পৃষ্ঠা, ৫০।

শিক্ষা। বিশেষ করে, যাদেরকে তিনি নিজ হাতে গড়ে তুলেছেন এবং বিপদে-আপদে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে নবিজির এই শিক্ষা কার্যকরভাবেই তিনি কাজে লাগাতে পারবেন। পরিচর্যার ধারাবাহিকতায় এদের মধ্য থেকেই তিনি বের করে আনবেন এমন একটা প্রজন্ম, যারা পরিচিত হবে 'কুরআনের প্রজন্ম' হিসেবে। গড়ে তুলবেন এমন একটি জাতি যারা শুধু মানবসেবার জন্য বেরিয়ে পড়বে দশ দিগন্তে; সৎকাজের আদেশ করবে। আর অসৎ কাজে বাধা দিবে। আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনবে। এ জাতিকে নিয়েই এমন একটা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে পারেন তিনি, যে রাষ্ট্রের সুশাসনের সুবাতাস ছড়িয়ে পড়বে প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যে।

সীরাত পাঠে একজন নেতা কিংবা সেনাপতির জন্যও রয়েছে খোরাক। তারা জানতে পারবেন বিভিন্ন রণকৌশল, অর্জন করবেন বিভিন্ন জাতি, গোত্র এবং সেনাবাহিনী পরিচালনার দক্ষতা। পরিকল্পনা প্রণয়নে পাবেন সুস্পষ্ট নির্দেশনা, বাস্তবায়নের কলাকৌশল। আর উদ্বুদ্ধ হবেন ইনসাফের মূলনীতি বাস্তবায়নে, যেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সৈনিক ও সেনাপতি এবং নেতা ও কর্মীর পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে। রাজনীতিবিদ শিখবেন বিপথগামী ও চরম রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে রাসূল সা. কীরূপ আচরণ করতেন। মুনাফিক সর্দার 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই, যে লোক ওপরে ওপরে ইসলাম গ্রহণের ভান করেছিল আর তলে তলে করেছিল বিরুদ্ধাচরণ; সারাজীবন নবিজির সঙ্গে করেছে শত্রুতা, এমন লোকের সাথেও রাসূল সা. কখনও অসদাচরণ করেননি। অথচ এই মুনাফিক লোকটাই কিনা রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনত; রাসূলকে দুর্বল করতে, লোকদেরকে তাঁর কাছ থেকে ভাগিয়ে নিতে এমন কোনো অপপ্রচার নেই যা সে করেনি। প্রতিবাদে রাসূল সা. তাকে ফুলের টোকাটি পর্যন্ত দেননি। প্রতিটি খারাপ আচরণে ধৈর্য ধরেছেন, সবুর করেছেন। এতে করে মুনাফিক-সর্দারের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায় একসময়; তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তার আপনজনেরা সমবেত হয় নবিজির নেতৃত্বের পতাকাতলে।

আলিমদের জন্য এই সীরাতের পরতে পরতে রয়েছে অনুপম সব শিক্ষা। তারা এমন কিছু উপকরণ পাবেন এতে যা তাকে কুরআন বুঝতে সহায়তা করবে; কারণ প্রায়োগিক দিক থেকে সীরাত কুরআনেরই এক ধরনের তাফসির। এতে বিধৃত হয়েছে কুরআন অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট এবং বহু আয়াতের তাফসির। এগুলো পাঠ করে আলিমরা আয়াতগুলোর প্রায়োগিক অর্থ বুঝে নেন সহজে। শারী'আতের হুকুম-আহকাম, তার মূলনীতি বের করে আনেন। এই পদ্ধতি অবলম্বনে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের সঠিক জ্ঞান অর্জন করেন তারা। 'নাসিখ-মানসুখ'সহ কুরআন সংশ্লিষ্ট

বহুবিধ জ্ঞান আলিমরা সীরাত পাঠেই পাবেন। প্রাণবন্ত ইসলামের মজা এবং এর সমুন্নত লক্ষ্য তারা খুঁজে পাবেন এখানেই।

কৃচ্ছতা অবলম্বনকারী পাবেন তার 'কৃচ্ছতাসাধনের' অর্থ, গতি-প্রকৃতি ও এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ব্যবসায়ী জানবেন ব্যবসার উদ্দেশ্য, লাভ-লোকসানের হিসাব এবং এর পদ্ধতি। বিপন্ন মানুষ সীরাত পাঠে শিখবে দৃঢ়তা এবং ধৈর্যের উচ্চতর স্তর। এতে করে ইসলামের পথে চলতে গিয়ে তার মনোবল উত্তরোত্তর চাঙা হবে। আল্লাহর প্রতি ঈমান আরও বৃদ্ধি পাবে। তারা সুনিশ্চিতরূপে জানবে, শুভ ফলাফল তো আল্লাহভীরুদের জন্যই।[২]

জাতি সীরাত থেকে শিখবে উন্নত শিষ্টাচার, প্রশংসিত চরিত্র-মাধুরী, বিশুদ্ধ 'আকীদা, 'ইবাদাত, হৃদয়ের নিষ্কলুষতা, আল্লাহর পথে জিহাদকে ভালোবাসা এবং শহিদ হবার বাসনা। আলি ইবনুল-হাসান এজন্যই বলেন, "যেভাবে কুরআনের সূরাগুলো আমরা শিখতাম, তেমন করে নবিজির সামরিক অভিযান, তাঁর সমর নীতিগুলোও আমরা আত্মস্থ করতাম।"

যুহরি বলতেন, "সমরবিদ্যায় রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের জ্ঞান।"[৩]

সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস বলেন, "আমার বাবা আমাদের নবিজির সমরনীতি সবিস্তারে শিক্ষা দিতেন। বলতেন, এগুলো তোমাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তিগাথা; এগুলো থেকে বিমুখ হয়ো না।"[৪]

জাতি গঠনে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আলিম-'উলামা, নেতৃবৃন্দ, ফাকীহগণ এবং প্রশাসকদেরকে ইসলামের গৌরব, মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তির পথ চেনাতে রাসূল-জীবনী আলোক বর্তিকার কাজ করে। এর পাতায় পাতায় রয়েছে মুসলিমদের উত্থান-পতনের ইতিহাস। ব্যক্তির পরিচর্যায়, মুসলিম সমাজ বিনির্মাণে, সমাজ জাগরণে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নবিজির যথোচিত প্রতিটি পদক্ষেপের খুঁটিনাটি বিষয়ের সব রসদ মজুদ রয়েছে সীরাতে।

সীরাত পড়তে পড়তে একজন মুসলিমের চোখের সামনে ভেসে উঠবে কাফিরদের দোরে দোরে আল্লাহর বাণী পৌঁছাতে নবিজির আপ্রাণ চেষ্টা, প্রতিটি বাধার মুখে তাঁর পর্বতসম ধৈর্য, নির্যাতন থেকে বাঁচাতে সাহাবিদেরকে ইথিওপিয়ায় হিজরাতের আদেশ প্রদানে তাঁর দূরদর্শিতা, দা'ওয়াতের মাধ্যমে তায়েফবাসীর মনজয় করার আপ্রাণ প্রয়াস, হাজ্জের মৌসুমে সেই দা'ওয়াতের বাণী বিভিন্ন গোত্রের সামনে

[২] দেখুন: মাদখাল লিদিরাসাতিস-সীরাহ, ড. ইয়াহইয়া আল-ইয়াহইয়া, পৃষ্ঠা, ১৪।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ইবনে কাসীর, (৩/২৫৬, ২৫৭), মুদ্রণ: দারুল-মা'রিফা, (৩/২৪২) দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৮, মাকতাবাতুল-মাআ'রিফ, লেবানন, মাকতাবাতুন নাসর-রিয়াদ।

[৪] দেখুন: আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (২/২৪২)।

১

নবিজির নুবুওয়াত-পূর্ব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা

কর্তৃত্বশীল সভ্যতা ও তাদের ধর্ম-বিশ্বাস

রোমান সাম্রাজ্য

পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্য 'বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য' নামেই সমধিক পরিচিত ছিল। গ্রিক, বলকান, এশিয়া, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর ও উত্তর-আফ্রিকা জুড়ে ছিল এ সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব। এর রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল, যা বর্তমানের ইস্তাম্বুল। এদের শাসকগোষ্ঠী ছিল চরম স্বৈরাচারী; প্রজা-সাধারণের ওপর তারা সীমাহীন জুলুম-নির্যাতন চালাত এবং তাদের ওপর চাপিয়ে দিত পাহাড়সম করের বোঝা। সংগত কারণেই অরাজকতা, নৈরাজ্য ও এক ধরনের চাপা ক্ষোভ ছেয়ে যায় সাম্রাজ্যময়। অন্যদিকে জীবনের কোনো উদ্দেশ্য না থাকায় জনগণ মজে থাকত নানা ধরনের রং-তামাশা আর খেলাধুলায়।

মিশরের কথা ধরা যাক। ধর্মীয় বাড়াবাড়ি এবং রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা ছিল তাদের মজ্জাগত। বাইজেন্টাইন শাসকরা দেশ এবং দেশের জনগণকে ভাবত তাদের গৃহপালিত দুগ্ধবতী বকরির মতো; দুধ দিলে ভালো, অন্যথায় তাড়িয়ে দাও। চুষে নিংড়ে নিত তাদের সবকিছু, বিনিময়ে তাদের জুটত না কিছুই।

সিরিয়ায় মানুষদের ধরে ধরে ক্রীতদাস বানানোসহ চলছিল সব রকম জুলুম নির্যাতনের মহোৎসব। শাসকরা জনগণের আস্থা অর্জনে মোটেই বিশ্বাসী ছিল না। তাই পেশীশক্তি এবং জোর-জবরদস্তির ওপরই ছিল তাদের আস্থা। এ যেন জোর যার মুল্লুক তার। নিজ জাতিকে এমনভাবে শাসন করত যেন তারা ভিন দেশের কেউ; মায়া-দয়ার লেশমাত্র ছিল না প্রজা-সাধারণের জন্য। ফলে সিরীয়দের ওপর ঋণের বোঝা এক জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে। শোধ দিতে পারত না অনেকেই; ঋণ পরিশোধে শাসকদের অনবরত চাপে চ্যাপ্টা হয়ে আদরের সন্তানকেও বিক্রি করতে বাধ্য হতো কেউ কেউ।[১]

এক কথায়, রোমান-সমাজ ছিল প্রচণ্ড অসংগতি ও চরম নৈরাজ্যভরা। এর সামগ্রিক একটা ছবি ফুটে ওঠে 'সভ্যতা : অতীত ও বর্তমান' বইটিতে এভাবে—

> "বাইজেন্টাইনদের সামাজিক-জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধেছিল ভয়ংকর সব অসংগতি। তাদের মন-মগজে আসন গেড়ে বসে ধর্মীয় বাড়াবাড়ি, ফকির-সন্ন্যাসবাদে ছেয়ে যায় গোটা দেশ। অজ্ঞ মানুষরাও গভীর থেকে গভীরতম ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনায় মেতে উঠত। অল্প বিদ্যা নিয়েই তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ত। পীর, ফকিরি ও মরমিবাদের প্রতিও ঝোঁক ছিল মানুষের মধ্যে।"

> "এ তো গেল মুদ্রার এপিঠের ছবি। ওপিঠের ছবিটা পুরো বিপরীত। এরা অর্থহীন ক্রীড়া-কৌতুক, প্রমোদ-বিনোদনে ডুবে থাকত আকণ্ঠ। এমনকি সেই যুগে তারা এমন এক স্টেডিয়াম নির্মাণ করেছিল, যেখানে ৮০ হাজার দর্শকের সংকুলান হতো। সেখানে বসে বসে উপভোগ করত মানুষে মানুষে জীবনহরণের নির্মম খেলা, যাদের তারা নাম দিয়েছিল গ্ল্যাডিয়েটর। এমনকি কখনো হিংস্র জানোয়ারের খাঁচায় মানুষকে ছেড়ে দিয়ে বাঁচা-মরার লড়াই উপভোগ করত। তারা ছিল চরম বর্ণবাদী। নীল এবং সবুজ এই দুই রঙে তারা জনগণকে বিভাজন করত। একদিকে তারা ছিল কথিত সুন্দরের পূজারি, অন্যদিকে সহিংস এবং বর্বর আচরণে তারা ছিল উন্মত্ত। খেলাধুলার নামে তারা যা করত, তার কোনোটা নির্মল আনন্দ উপভোগের জন্য ছিল না। বরং অধিকাংশ সময়েই তা শেষ হতো রক্তাক্ত পরিণতিতে। প্রজা-সাধারণের জন্য তাদের শাস্তির বিধানগুলোও ছিল বিভৎস। রং-তামাশা, ভোগ-বিলাসিতা, কূটচালবাজি, চাটুকারিতা, নির্লজ্জতাসহ যাবতীয় বদ অভ্যাসের মূর্ত প্রতীক ছিল শাসকদের জীবন।"[২]

পারস্য সাম্রাজ্য

পারস্য বা কিসরা নামেই সাম্রাজ্যটি সর্বাধিক পরিচিতি পায়। এটি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য থেকে ভৌগোলিক আয়তনে যেমন বহুগুণে বড় ছিল, তেমনি সামরিক দিক থেকেও ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। তৃতীয় শতকের শুরুতে সেখানে মনুর গড়া জুরথুস্ত্রবাদ ও মনুবাদের মতো ধর্মীয় বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পায়। তারপর পঞ্চম শতকের শুরুতে প্রকাশ ঘটে মাযদাকি মতবাদের। রাজ্যজুড়ে নৈরাজ্য ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ানোই যেন ছিল এদের নেশা, যা শেষ পর্যন্ত উসকে দেয় কৃষক-বিপ্লবকে। এরা নারীদের ধরে নিয়ে বন্দি করে রাখত। বিভিন্ন এলাকায় চোরা-গোপ্তা হামলা চালিয়ে একে একে অনেক মানুষের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল করে নেয়। খেত-খামার, ঘরবাড়ি কোনো কিছুই রেহাই পায়নি তাদের তাণ্ডবলীলা থেকে। তাদের আক্রমণে

অনেক এলাকা এমন বিরান ভূমিতে পরিণত হয়, যেন কোনো কালেই কেউ বুঝি বাস করেনি সেখানে।

শাসনধারা ছিল বংশ পরম্পরা; বাবার মৃত্যুর পর ছেলে গদিতে বসবে—এটা একরকম অলিখিত সংবিধানে পরিণত হয়। তারা নিজেদেরকে মনে করত সাধারণ মানুষের চেয়ে উন্নত কোনো সৃষ্টি—অবতার; বা দেবতার ঔরসজাত সন্তান। দেশটাকে মনে করত পৈতৃক সম্পত্তি। রাজ্যের সমুদয় রাজস্ব নিয়ে খেয়াল-খুশিমতো স্বেচ্ছাচারী ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করত। চলাফেরা ছিল চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের মতো লাগামহীন। শাসকদের এমন আচরণ দেখে অনেক কৃষক চাষাবাদই ছেড়ে দেয়। শাসকদের সেবাদাস কিংবা লাঠিয়াল বাহিনী হওয়া থেকে পালিয়ে গিয়ে কেউ বা আশ্রয় নেয় ঘরের কোণে কিংবা উপাসনালয়ে। রোম-পারস্যের মধ্যে সংঘটিত ইতিহাসের দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শিকার ছিল এসব জনগণ; অথচ এতে তাদের আদৌ কোনো কল্যাণ ছিল না। স্রেফ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই শাসকরা এ যুদ্ধ বাধিয়ে রাখত বছরের পর বছর ধরে।[৩]

ভারত

ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, ষষ্ঠ শতকের শুরুতে ধর্মীয়, চারিত্রিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতীয় সাম্রাজ্যেও চরম অবনতি হয়েছিল। নৈরাজ্য করে বেড়াত এখানকার মানুষেরা। তাদের হাত থেকে রেহাই পেত না উপাসনালয়ও। কারণ, ধর্ম নিজেই নৈরাজ্যের গায়ে পবিত্রতা ও কথিত ধার্মিকতার একটা খোলস চড়িয়ে দিয়েছিল। সমাজে নারীরা ছিল চরম অবহেলিত। তাদের না ছিল কোনো মর্যাদা, না নিরাপত্তা। সতীদাহ প্রথার নামে মৃত স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে মারত তারা। কেউ কোনোভাবে প্রাণে বেঁচে গেলেও এ বিধবাদের জন্য পুনরায় বিয়ে করা ছিল অবৈধ। শ্রেণি-বৈষম্যের জন্য ভারত ছিল পৃথিবীর অন্য সকল সমাজ থেকে আলাদা; আইনগতভাবেই তারা এই কালোকানুন সমাজে চালু করে। হিন্দু পুরোহিতরা সেগুলোকে মুড়িয়ে দেয় ধর্মীয় আবরণে। একসময় আইনটা সমাজে নৈতিক ভিত্তি লাভ করে। হয়ে ওঠে তাদের জীবনের অলঙ্ঘনীয় সংবিধান।

হিন্দুরা ছিল শতধা বিভক্ত ও বিশৃঙ্খল একটি জাতি। এ কারণে তাদের সমাজে সব সময়ই অস্থিরতা বিরাজ করত। এক সময় এই অস্থিরতা স্থানীয় বিভিন্ন শাসকদের মধ্যে বিধ্বংসী যুদ্ধের ইন্ধন জোগাত।

পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা ও জাতিগোষ্ঠী থেকে একপ্রকার বিচ্ছিন্নই ছিল তারা; কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে এ সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ বেখবর। স্বভাব-চরিত্রে তারা

ছিল কঠোর ও স্বৈরাচারী প্রকৃতির। শ্রেণিবৈষম্যের জের ধরে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ছিল তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। একজন হিন্দু ঐতিহাসিক ভারতের ইসলামপূর্ব যুগ প্রসঙ্গে বলেন,

> "হিন্দুরা বাকি দুনিয়া থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন, শামুকের মতো নিজ খোলসের ভেতরে আবদ্ধ। পৃথিবীর অন্যান্য সমাজ-সভ্যতা ও সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে তারা ছিল একেবারেই অজ্ঞ। এ অজ্ঞতা তাদেরকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তোলে। জন্ম নেয় নানা জড়তা ও স্থবিরতা; যা তাদেরকে দিনে দিনে আরও অধঃপতন ও অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়। সাহিত্য প্রাণহীন ও বিবর্ণ রং ধারণ করে। স্থাপত্যশিল্প, চিত্রকলা, চারু ও কারুকলা শিল্পেরও ছিল একই রকম দৈন্যদশা।"[৪]

> "হিন্দুসমাজ ছিল জড়বাদী; সবকিছুতে স্থবির ও অচল। শ্রেণিবৈষম্য ছিল প্রকট, পরিবারে পরিবারে চলত জাতে ওঠার লড়াই। বিধবা বিয়েকে তারা দেখত অন্যায় হিসেবে। খাদ্য-খাবার নিয়েও তাদের মধ্যে ছিল নানা রকম কুসংস্কার; এটা খেত তো ওটা খেত না। অকারণে কষ্ট দিত নিজেদের। আর অস্পৃশ্যরা তো ছিল সমাজচ্যুত; সমাজছাড়া হয়ে একরকম অসহায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হতো তারা।"[৫]

ভারতের অধিবাসীরা চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল—

- ব্রাহ্মণ : মন্দির ও হিন্দু ধর্মের পুরোহিত শ্রেণি।
- ক্ষত্রিয় : যুদ্ধ-বিগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত দল।
- বৈশ্য : কৃষি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্বে নিয়োজিত সম্প্রদায়।
- শূদ্র : গোলামি, দাসবৃত্তি ইত্যাদিই ছিল এ শ্রেণির মূল কাজ। সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণির এরা। তাদের ধারণামতে, বাকি তিন শ্রেণির সেবা করার জন্য পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা নিজের পা থেকে এদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এই শ্রেণিবিভাজন ব্রাহ্মণদেরকে সমাজের সবচেয়ে সম্মানজনক আসনে আসীন করে। আক্ষরিক অর্থেই তাদের জন্য ছিল সাত খুন মাপ। তাদের ওপর কোনো কর ধার্য করা হতো না। অন্যদিকে, শূদ্রদের জন্য ধন-সম্পদ উপার্জন কিংবা সঞ্চয় করার অধিকারও ছিল না। এমনকি ব্রাহ্মণদের পাশে তাদের বসাও ছিল মহাপাপ। আর হাত দিয়ে ছোঁয়াটা তো কল্পনাই করা যেত না। ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ।[৬]

তৎকালীন ধর্মীয় অবস্থা

অন্ধকার এ যুগ ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট যুগ। মানবতা নেমে গিয়েছিল সর্বনিম্ন স্তরে। ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তথা সর্ববিষয়ে। জীবনের এমন কোনো দিক ছিল না যেখানে নৈরাজ্য তার থাবা বসায়নি। চিন্তা-ভাবনা, আকীদা-বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতি সবকিছুতেই জেঁকে বসে জাহিলিয়্যাত। মূর্খতা, প্রবৃত্তি-চরিতার্থ, লাম্পট্য, নিকৃষ্টতা, স্বৈরাচার ইত্যাদি ছিল সমাজের সাধারণ চিত্র।[৭]

আল্লাহর দীনের মধ্যে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন-পরিবর্ধন, বিকৃতি-সাধন, মনগড়া কথার প্রসার ইত্যাদির কারণে তাদের জীবনে আল্লাহর বিধানের প্রভাব প্রায় শূন্যে নেমে আসে। ফলে আল্লাহর বাণীর আবেদন হারিয়ে যায় পুরোপুরি। আকীদার নানা জটিল তত্ত্বীয় বিষয়ের আলোচনা নিয়ে লোকেরা মগ্ন থাকত, যা এক সময় আল্লাহর দীনের মধ্যে মানুষের নানা বিকৃত মতবাদ অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে নানা দল-উপদলে এবং তা শেষ পর্যন্ত গিয়ে গড়ায় ভয়াবহ যুদ্ধবিগ্রহে। অন্যদিকে যারা এ বিকৃতি থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছিলেন সংখ্যায় তারা ছিলেন খুবই নগণ্য। সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে, অন্তত নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টায় লোকালয় ছেড়ে তারা আশ্রয় নেয় নির্জন কোনো স্থানে। একারণে অনৈতিকতা মানব সমাজকে আরও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার সুযোগ পেয়ে যায়। ফলে আসন গেড়ে বসে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

লোকেরা হয় দীন-ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, নয় ধর্মের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। কেউ হয়তো কোনো ধর্মে সত্যিকার অর্থে প্রবেশই করেনি কখনো। কেউ-বা আবার ধর্মের বিকৃত রূপটাকে পরম সত্য মেনে আরাধনা করছে। অন্যদিকে, শারী'আতের ছিল করুণ দশা। তারা আল্লাহর শারী'আহকে সম্পূর্ণ বর্জন করে চলত। উপরন্তু শারী'আতের নামে তারা মনগড়া এমন অনেক নিয়ম-কানুন বানিয়ে নেয়, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। সংগত কারণেই তাদের এসব বানোয়াট নিয়ম-কানুন ছিল মানুষের স্বভাবধর্ম ও বিবেকের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ধর্মীয় পাদরি-পুরোহিত, রাজা-বাদশারা ছিল এই অনৈতিকার একান্ত পৃষ্ঠপোষক। পৃথিবী তলিয়ে যায় অজ্ঞতার নিকষ কালো অন্ধকারের অতল গহ্বরে, জাহিলিয়্যাতের অশুভ ছায়া সবকিছুকে ঢেকে ফেলে। মহান আল্লাহ তা'আলার দেওয়া বিধানগুলো বিকৃত হয়ে যায় সম্পূর্ণরূপে।

ইহুদিধর্ম

এ ধর্মটি আসমানি বিধানের বাহক হলেও, কালের পরিক্রমায় বিকৃত হয়ে কেবল নানা রকম আচার-সর্বস্বতা এবং অন্ধ-অনুকরণের সমষ্টিতে পরিণত হয়; এতে না ছিল কোনো প্রাণের ছোঁয়া, না ছিল কোনো সজীবতা। ইহুদিরা তাদের ভিন্নধর্মী প্রতিবেশী ও তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল জাতির ধর্ম-বিশ্বাস দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে; তাদের অনেক আচার-আচরণ, কৃষ্টি-কালচার নানা রকম জাহিলিয়্যাত ও মূর্তিপূজার মতো পৌত্তলিক কর্মকাণ্ডের নাগপাশে আটকে পড়ে। স্বয়ং ইহুদি ঐতিহাসিকদের[৮] কথায়ও এ বক্তব্যের স্বীকৃতি মেলে। ইহুদি বিশ্বকোষে এসেছে,

> "মূর্তিপূজারি ও মুশরিকদের ওপর নবি-রাসূলদের মনঃকষ্ট, ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি এ কথাই প্রমাণ করে যে, এগুলোর প্রতি আকর্ষণ বানু ইসরাঈলের মন-মননে একেবারে জেঁকে বসেছিল। ব্যাবিলনে তাদের নির্বাসন থেকে ফিরে আসার আগপর্যন্ত ওই বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হয়নি। কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার প্রতি আকর্ষণই ছিল তাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু। তাদের এ বৈশিষ্ট্যের জলজ্যান্ত সাক্ষী তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থ তালমুদ।"[৯]

নবিজির আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদি-সমাজ পৌঁছে যায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকলাঙ্গতার চূড়ান্ত পর্যায়ে। পাঠক, আপনি যদি ব্যাবিলনের তালমুদ (যার পবিত্রতা নিয়ে ইহুদিরা বড়াই করে এবং খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে ইহুদিদের মাঝে যার চর্চা ছিল ব্যাপক) অধ্যয়ন করেন, তবে এর এমন কিছু নমুনা পাওয়া যাবে যার যৌক্তিকতার প্রশ্নে কোনো সুস্থ বিবেক সায় দেবে না। তাদের কথার অসারতা, আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের বেয়াদবির স্পর্ধা দেখে আপনি স্তম্ভিত হবেন। দেখবেন কী অনায়াসেই না তারা সত্যের অপলাপ করছে, দীন-ধর্মের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে।[১০]

খ্রিষ্টধর্ম

নিজ ধর্মের মধ্যে ধর্মযাজকদের বিকৃতি, পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং মূর্খদের মনগড়া ব্যাখ্যায় খ্রিষ্টধর্ম তখন যায় যায় অবস্থা। তাদের হাতে পড়ে খ্রিষ্টধর্ম তার প্রাচীন শিক্ষা হারিয়ে ফেলে। 'ঈসার আগমন হয়েছিল মানুষকে এক আল্লাহর 'ইবাদাতের দিকে আহ্বান করার জন্য। অথচ তার অনুসারীরা তার এই মহান শিক্ষা ভুলে যায় বেমালুম। তাওহীদের আলো, আল্লাহর একনিষ্ঠ 'ইবাদাত ঢাকা পড়ে যায় নানা রকম পৌত্তলিকতাপূর্ণ আঁধারের চাদরে।[১১] যিশুর আসল প্রকৃতি এবং তার নানা বৈশিষ্ট্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ নিয়ে ইরাকি ও সিরিয়ার খ্রিষ্টানদের সাথে মিশরের

খ্রিষ্টানদের যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধ এমন ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, তাদের ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উপাসনালয়সহ সবকিছু পরিণত হয় সামরিক ক্যাম্পে। নানান রূপে, নানান রঙে খ্রিষ্টসমাজে পৌত্তলিকতা ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রিষ্টধর্মের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে যা এসেছে তা এরকম :

> "মনে করা হতো মূর্তিপূজার অবসান ঘটেছে। কিন্তু তা সমূলে উৎপাটিত হয়নি; বরং মন-মগজে তা আরও গেড়ে বসেছে। আগের মতোই সবকিছু চলছে খ্রিষ্টবাদের দোহাই পেড়ে এবং ধর্মের নামের আড়ালে। খ্রিষ্টধর্মের কেউ যদি শহিদ হতো, তবে অন্যরা তাকে মর্যাদা দেওয়ার নামে নানা রকম বাড়াবাড়ি করত; তার প্রতি বিভিন্ন রকম অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা ও গুণাবলি আরোপ করত। এমনকি তাদের প্রতিমূর্তিও বানাত। এরপর এভাবেই আস্তে আস্তে শুরু হয় শহিদ ও ধর্মগুরুদের পূজা। চতুর্থ শতাব্দী তখনও শেষ হয়নি; চারদিক ভরে ওঠে শহিদ-ভক্তি, পীর-ফকির পূজায়। সৃষ্টি হয় নতুন এক আকীদা-বিশ্বাসের। এই বিশ্বাসের মূল কথা ছিল: পীর-মুর্শিদরা আসলে পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তার কায়া; রবের সকল সিফাত-বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে সতত বিরাজমান। এই পুণ্যাত্মারা, এই সেইন্টরা আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে—এমনই বিশ্বাস ছিল তাদের। মধ্যযুগে পবিত্রতা, শুদ্ধতা এবং নিষ্কলুষতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে তারা। মূর্তি-উৎসবের পুরাতন নাম পরিবর্তিত হয়ে নতুন নাম ধারণ করল। এমনকি ৪০০ খ্রিষ্টাব্দে 'সূর্যপূজার পুরাতন উৎসব'-এর নাম হয় 'বড়দিন' বা 'ক্রিসমাস ডে'।"[১২]

নতুন ক্যাথলিক বিশ্বকোষে এসেছে :

> "তাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, যিশুর জীবন, চিন্তা ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত ৩টি বস্তুর এক সমন্বিত রূপে গঠিত হন এক ইলাহ। চতুর্থ শতকের শেষ সময় থেকে চলে আসছে এ বিশ্বাসের ধারা; সবার নিকট চরম পূজনীয় এমন এক জাতীয় বিশ্বাসে পরিণত হয় বিশ্বাসটি। পুরো খ্রিষ্টানজগৎ এই বিশ্বাসে অটল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে ত্রিত্ববাদ-আকীদার ক্রমবিকাশের ধারা বাধাগ্রস্ত হয় এবং এ রহস্যের সকল পর্দা উন্মোচিত হয়ে যায়।"[১৩]

খ্রিষ্টানদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। একজন আরেকজনকে গাল পাড়ত 'কাফির' বলে। খুনোখুনি শুরু হলো নির্বিচারে। অনৈতিকতার বিরুদ্ধে লড়াই, সমাজ সংস্কার এবং মানবতার কল্যাণ রয়েছে এমন বিষয়ের প্রতি জাতিকে দা'ওয়াত দেওয়া থেকে তারা উদাসীন থাকল, নিবৃত রইল।[১৪]

অগ্নিপূজক

প্রাচীনকাল থেকেই অগ্নিপূজকরা প্রকৃতিপূজারি হিসেবে পরিচিত। তাদের প্রকৃতিপূজার সবচেয়ে বড় উপাদান আগুন। দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত শিখা-অনির্বাণের দেখা পাওয়া যেত। তারা পূর্ণ মনোনিবেশ করে এর পূজায়; তৈরি করে মন্দির এবং প্রতিমা। মন্দিরের ভেতরে মেনে চলা হতো বেশকিছু বিধিবিধান এবং আদব-শিষ্টাচার। অন্যদিকে মন্দিরের চার দেয়ালের বাইরে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নচিত্র—পূজকরা চলাফেরা করত স্বাধীনভাবে, মন যা চাইত তা-ই করে বেড়াত তারা। তখন তাদের মধ্যে আর যারা দীন মানত না তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ ছিল না।

একজন প্রখ্যাত ডাচ ঐতিহাসিক অগ্নিপূজকদের ধর্মগুরু এবং তাদের কাজকর্মকে তার 'সাসানিদের যুগে ইরান' বইতে এভাবে তুলে ধরেন—

> "অগ্নিপূজকদের দিনে চারবার সূর্যের উপাসনা করতেই হতো। সেই সঙ্গে চাঁদ, আগুন এবং পানিরও পূজা করত তারা সমান তালে। তাদেরকে প্রত্যহ বিশেষ কিছু মন্ত্র জপ করতে হতো। ঘুমের সময়, ঘুম থেকে জেগে, গা-গোসলের সময়, পোশাক পরিধান করতে, খাওয়া-দাওয়া, হাঁচি-কাশি, চুল কাটানো, নখ কাটা, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া, চেরাগ-কুপি জ্বালানোসহ যাপিত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তারা মুগ্ধ হয়ে জপ করত এই মন্ত্রগুলো। আগুন নিভে যাক—এমন প্রার্থনা করা ছিল তাদের জন্য বারণ, বাঘে-ছাগে এক ঘাটে পানি খাওয়া দুরস্থ হলেও আগুন-পানির মিশেল তাদের জন্য ছিল হারাম। এই কামনাও করা যাবে না যে, খনিগুলোতে মরচে ধরে যাক! কারণ, খনি তাদের কাছে পবিত্র।"[১৫]

ইরানিরা আগুন সামনে রেখে 'ইবাদাতে দাঁড়াত। ইয়াজদাগির্দ সাসানিদের সর্বশেষ রাজা, একবার সূর্যের নামে কসম কেটে বলে,

> "ওই সূর্যের নামে আমি কসম করছি, যিনি সবচেয়ে বড় ইলাহ।" প্রতি যুগেই অগ্নিপূজকরা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করত মনে-প্রাণে। ধীরে ধীরে পৌত্তলিকতাই হয়ে ওঠে তাদের লোগো, তাদের ধর্মীয় প্রতীক। তারা বিশ্বাস রাখত দুই খোদাতে। একজন আলো তথা কল্যাণের ইলাহ, অন্যজন অন্ধকার তথা অমঙ্গলের।[১৬]

বৌদ্ধধর্ম

এই ধর্ম ভারত এবং মধ্য-এশিয়ায় পালিত হতো সবচেয়ে বেশি। অনুসারীরা জায়গায়-বেজায়গায় গড়ে তুলে গৌতম বুদ্ধের প্রতিমা। বাড়ি থাকুক কিংবা সফরে, যেখানেই যেত তারা, সঙ্গে বুদ্ধের মূর্তি বয়ে বেড়াত;[১৭] এবং সে মূর্তিতে মাথা ঠেকানো তাদের চা-ই চাই। তৈরি করত নিত্যনতুন প্যাগোডা।

ব্রাহ্মধর্ম

ভারতের আদি ধর্মের নাম ব্রাহ্মধর্ম। এটি হিন্দু ধর্মেরই আদিরূপ। কোনো সন্দেহ ছাড়াই বলা চলে, হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের মধ্যে অদ্ভুত একটা মিল ছিল—দুটি ধর্মই বহুদেবতায় বিশ্বাসী। এ বিশ্বাসের নড়চড় হয়নি এতটুকু; আগে যেমন ছিল, এখনো তেমনই। অনেক মা'বূদ, অনেক উপাস্যের প্রাদুর্ভাব ছিল এই ধর্মের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। খ্রিষ্ট ষষ্ঠ শতকে এসে এ ধর্ম তার চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছে। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত পৃথিবীটা ডুবে ছিল পৌত্তলিকতায়। খ্রিষ্ট, ইহুদি, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মধর্মের অনুসারীরা সবাই কেমন যেন পৌত্তলিকতার মাহাত্ম্য, তার পবিত্রতা বর্ণনা কে কার চেয়ে বেশি করতে পারে এ প্রতিযোগিতায় নেমেছে; কেমন যেন একই ময়দানে ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নেমেছে ঘোড়ারা।

প্রতিটি জাতির মধ্যে, প্রতিটি পর্যায়ে এই অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ার কথা রাসূল ﷺ তাঁর এক অভিভাষণে এভাবে বলে গেছেন—

> "জেনে রাখো! আমার রব আমাকে আদেশ করেছেন যে, আজকের এই দিনে তিনি যা কিছু আমাকে শিখিয়েছেন, তার মাধ্যমে আমি যেন তোমাদের অজানা বিষয়গুলো জানিয়ে দিই: 'একজন বান্দাকে আমি যা কিছু দিয়েছি তার সবই হালাল। আমার বান্দাদের সবাইকে হানিফ[১৮] তথা নিষ্ঠাবান করেই আমি সৃষ্টি করেছি। শয়তানরা তাদের কাছে এসে দীনের পথ থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করে এবং তাদের জন্য আমি যা হালাল করেছি, তা হারাম ঘোষণা করে। তাদেরকে আদেশ করে আমার সঙ্গে শির্ক করতে; অথচ শির্কের পক্ষে আমি কোনো প্রকার দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করিনি।' আর নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তা'আলা তখন আহ্‌লে-কিতাবদের অল্পকিছু লোক ছাড়া, দুনিয়াবাসীর প্রতি, কি আরব কি অনারব নজর করেন অবজ্ঞাভরে।"[১৯]

বিভিন্নভাবে মানবজাতির ভিন্নপথে গমনের ইঙ্গিতই পাওয়া যায় হাদীসটিতে; আল্লাহর সঙ্গে শির্ক, তাঁর শারী'আহকে প্রত্যাখ্যান, ওয়াহি-নির্ভর দীনের কোনো কোনো সংস্কারকের বিপথে গমন এবং জাতির ভ্রষ্টতার ব্যাপারে তাদের একপেশে পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি-সহ নানাভাবেই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।[২০]

আরবদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এবং তাদের সভ্যতার ইতিহাস

প্রাচীন আরব

ঐতিহাসিকরা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে আরবদেরকে তাদের পরবর্তী বংশধরদের ধারা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করেছেন।[২১] যথা :

বা'ইদা আরব

'আদ, সামূদ, আমালিকা, তস্‌ম, জাদিস, উমাইম, জুরহুম, হাদরামাউত এবং তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরও কিছু গোত্র নিয়েই গঠিত বা'ইদাহ আরব। ইসলাম আসার আগেই এদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। শাম (সিরিয়া ও তার আশপাশের এলাকা নিয়ে গঠিত) ও মিশর অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত ছিল এদের রাজত্ব।[২২]

'আরিবা আরব

এ ধারার লোকেরা ইয়া'রুব ইবনু ইয়াশজুব ইবনু কুহতানের বংশধর। এদেরকে কাহতানিয়া[২৩] আরব নামে ডাকা হতো। এরা দক্ষিণ আরব নামেও সবার কাছে পরিচিত ছিল[২৪] ইয়েমেনের রাজন্যবর্গ এবং মা'ঈন, সাবা এবং হিময়ার গোত্রের লোকজন ছিল এই ধারার অন্তর্গত।[২৫]

আদনানি আরব

এ ধারার আরবদেরকে বলা হতো আদনানি আরব। কারণ, এরা আদনানের বংশধর। এ আদনানের বংশধারা গিয়ে মিলিত হয়েছে নবি 'ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীমের সঙ্গে। এরা মুসতা'রিবাহ আরব নামে পরিচিতি পেয়েছিল। অর্থাৎ এরা বহিরাগত আরব—আরবে এসে বসতি স্থাপন করে এবং আরবি ভাষা গ্রহণ করে। এদের শরীরে অনারব রক্তধারা প্রবাহিত। তারপর অনারব ও আরব এই দু-ধারার রক্ত

বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একটা সময় এসে নতুন ধারার এই আদনানি আরবদের মাতৃভাষা হয়ে ওঠে আরবি।

এ আদনানি ধারার আরবরা ছিল উত্তরের আরব। তাদের সত্যিকারের মাতৃভূমি মাক্কা। এরা সবাই জুরহুম গোত্র এবং নবি 'ইসমাঈলেরবংশধর। ইবরাহীম رَحِمَهُمَاللَّهُ তার স্ত্রী ও সন্তান 'ইসমাঈলকে আল্লাহর আদেশে মাক্কায় রেখে গিয়েছিলেন। 'ইসমাঈল বড় হন জুরহুম গোত্রে। শেখেন আরবি ভাষা। বড় হয়ে এ বংশেরই একজন মেয়েকে বিয়ে করেন তিনি। তার সন্তানরা বেড়ে ওঠে জুরহুমদের মতো আরব হিসেবেই।

নবি ইসমাইলের বংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আদনান ছিলেন রাসূলুল্লাহর ঊর্ধ্বতন পুরুষ। আদনান থেকেই আরব গোত্র-উপগোত্রগুলোর পথচলা শুরু। আদনানের পর আসে তার ছেলে মা'দ। এরপর আসে নিযার। নিযারের পর আসে তাঁর দুই সন্তান মুদার ও রাবি'আ।

রাবি'আ ইবনু নিযারের বংশধরের লোকেরা আবাস গড়ে তোলে পূর্বে; 'আবদুল-কাইস গোত্র বাহরাইনে, হানিফা গোত্র ইয়ামামাতে, বাহরাইন ও ইয়ামামার মাঝামাঝি কোনো এক জায়গায় বাক্‌র ইবনু ওয়াইলের বংশধররা বসবাস শুরু করে। তাগলাব গোত্র ফোরাত অববাহিকা অতিক্রম করে আরও সামনে এগিয়ে গিয়ে দজলা ও ফোরাত নদীর উপদ্বীপ অঞ্চলে আবাস গাড়ে। আর তামিমের লোকেরা গিয়ে ওঠে বাস্‌রার মরুপল্লিতে।[২৬]

অন্যদিকে, মুদারের শাখা সালীম গোত্রটি মাদীনার কাছাকাছি একটি জায়গায় তাদের নিবাস গড়ে তোলে। সাকীফ গোত্র তায়িফে, হাওযান গোত্রের বাকি অংশ মাক্কার পূর্বে এবং পূর্ব-তাইমা থেকে শুরু করে পশ্চিম কূফা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আসাদ বংশধরদের বাসস্থান। যুবইয়ান এবং 'আব্‌স বংশধরদের বসবাস ছিল তাইমা থেকে হাওয়ারান পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায়।[২৭]

অধিকাংশ কুলজিশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ও অন্য জ্ঞানীগণ আরবদেরকে দুইভাগে ভাগ করেন: আদনানি আরব ও কহতানি আরব। তবে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, আরবরা সবাই আদনানি ধারার। আর কাহতানি আরবদের বংশধারা গিয়ে মিশেছে, তাদের মতে, নবি 'ইসমাঈল ﷺ পর্যন্ত।[২৮]

ইমাম বুখারি তার সহীহ বুখারিতে এই বিষয়ে 'ইসমাঈলের সঙ্গে ইয়েমেনবাসীদের (কাহতানি আরব) সম্পৃক্ততা' নামে একটি অধ্যায় প্রণয়ন করেন। অধ্যায়টিতে তিনি সালামা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "একদিন রাসূল ﷺ তিরন্দাজি চর্চা করছিলেন। তখন তিনি আসলাম গোত্রের এমন কিছু লোকের কাছে গিয়ে বললেন, 'হে 'ইসমাঈলের বংশধর! নিক্ষেপ করো। কারণ, তোমাদের পিতা